দায়িত্বশীল পরিবারই সুখী পরিবার

পরিবার হলো, পৃথিবীর সভ্য সমাজের অন্যতম টেকসই প্রাকৃতিক সংগঠন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিবর্তনের ধারায় অনেক কিছু কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও পরিবার আজও টিকে আছে এবং আগামী সভ্যতাকে ধরে রাখতে হলে পরিবারকে টিকে থাকতে হবে। আমরা পৃথিবীর সব মানুষ কোন না কোন ভাবে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত আছি। এই ক্ষুদ্র সংগঠনের রয়েছে কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা উপাদান। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য আদর্শ পরিবার প্রয়োজন। পরিবারে যদি অবনতি বা ভাঙ্গন দেখা দেয়, তাহলে সে সমাজেও অবনতি দেখা যায়। তাই এ সমাজকে যদি উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে চাই অতি প্রথম প্রয়োজন পরিবারের উন্নয়ন। পরিবারের দায়িত্বশীল ভূমিকা সমাজ তথা দেশে ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষের জ্ঞান, স্বাধীনতা ও বিবেকের সঠিক অনুশাসনই মানুষকে দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করে।

পরিবার গঠন

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে নারী ও পুরুষ করেই সৃষ্টি করেছেন এবং প্রকৃতিগত ভাবেই একজন নারী ও একজন পুরুষ এককভাবে পূর্ণাঙ্গ নয়। যেহেতু তাদের মধ্যে অপূর্ণতা রয়েছে, সেহেতু পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে যৌবনে তাদের কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে, চিন্তা-চেতনায় বিশেষ মিল দেখা যায়। অনুভূতির এ অভিন্ন প্রকাশ একজন পূর্ণবয়স্ক নারী ও পুরুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসে, যা বিয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। সৃষ্টিকর্তা ভালবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার ভালবাসা মানুষের দেহ-মন-আত্মায় আপ্লুত হয়ে সহজাত প্রবৃত্তি লাভ করেছে। নারী-পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তির কারণে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে এবং বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠন করে। পরিবার গঠনের মূলকেন্দ্র হলো প্রেম বা ভালবাসা।

মানুষ পরিবার সম্পর্কে ধারণা কখন লাভ করেছে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও পরিবার কোন কৃত্রিম সংগঠন নয়। তবে সমাজের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের

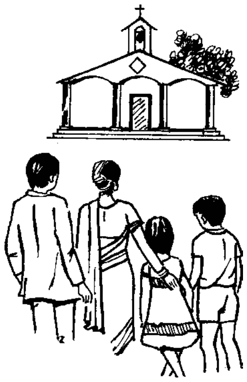

সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আকৃতি, প্রকৃতি, গঠনপ্রণালী ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রভাব পড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিবার হলো, সমাজ কোষ বা সমাজের প্রাণকেন্দ্র। এ প্রাণকেন্দ্র হাসি-কান্না, মায়া-মমতা, স্নেহ-স্পর্শে উজ্জ্বল, তিল তিল ভালবাসায় গড়ে উঠা মানব বন্ধন, যা সব সময় মানুষকে কাছে টানে। অন্যভাবে বলা যায়, পরিবার হলো প্রেম ও জীবনের সমাজ, যেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন পারস্পরিক সহভাগিতা, সহযোগিতা ও সাহচর্যে জীবন যাপন করে। পৃথিবীর প্রতিটি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠেছে এ বিশ্ব পরিবার। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একটি পরিবারের শুরু।

বিবাহ

বিয়ে হলো, নারী পুরুষের ভালবাসার বন্ধন। খ্রীষ্ট ধর্ম মতে বিয়ে হলো পারস্পরিক সন্ধি এবং একটি সাক্রামেন্ত। মুসলিম ধর্মমতে বিয়ে হলো, পারস্পরিক চুক্তি। হিন্দুধর্ম মতে বিয়ে হলো, পারস্পরিক বন্ধন এবং একটি সংস্কার। প্রত্যেক ধর্মে বিয়ের উদ্দেশ্য মূলত একই, তা হলো –

- ◆ জৈবিক চাহিদা পূরণ
- ◆ বংশ বৃদ্ধি করা
- ◆ মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ (পারস্পরিক প্রেম, সম্মান ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা)

নারী পুরুষের প্রেম, সম্মান এবং বিশ্বস্ততাই একে অপরকে নিবিড় সংস্পর্শে নিয়ে আসে এবং একদেহ, এক মন ও এক আত্মায় মিলিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। দাম্পত্য সুখের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যাপারে ক্যারেন হর্ণী তিনটি মূল দিকের কথা বলেছেন : (১) দৈহিক সম্পর্ক (২) মানসিক সম্পর্ক

(৩) সাংসর্গিক সম্পর্ক। এই ত্রিভুজ সম্পর্কের ভেতরেই দাম্পত্য জীবন আবর্তিত হয়। পোপ ৬ষ্ঠ পল 'মানবজীবন' নামক সার্বজনীন পত্রে উল্লেখ করেছেন 'দাম্পত্য প্রেম হ'ল পূর্ণভাবে মানসিক অর্থাৎ একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ ও আত্মিক। সুতরাং এটি কেবল সাধারণ প্রবৃত্তি ও ভাবপ্রবণতাই নয়, এটি প্রধানত স্বাধীন ইচ্ছার একটি কাজ আত্মায় পরিণত হয় এবং একত্রে উত্তমতা লাভ করে।' বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করে। দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকার অর্থে সুখী হতে পারে। দায়িত্বশীল হওয়ার অর্থ হলো, নিজের কাজ ও কর্মফলের জন্য দায়ী থাকা।

পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবার যেহেতু একটি ক্ষুদ্র সংগঠন সেহেতু এটাকে গতিশীল ও টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে। দায়িত্ব কর্তব্যগুলির মধ্যে সন্তান লালন পালন, শিক্ষা কার্যক্রম, অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং বৃদ্ধদের দেখাশোনা করা অন্যতম। বিশেষজ্ঞদের মতে দায়িত্বগুলোকে নিম্নরূপে দেখানো যায় –

- ◆ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ◆ সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ◆ সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব
- ◆ সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ব

স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

যে মুহূর্ত থেকে পরস্পর বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে মুহূর্তে স্বামীর দেহের অধিকারী তার স্ত্রী, তেমনি স্ত্রীর দেহের অধিকারী তার স্বামী এবং একজন অন্যজনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্বামী-স্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব হলো ভালবাসা দেওয়া ও ভালবাসা পাওয়া। বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ শর্তহীন ভালবাসার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। যেহেতু ভালবাসা জীবন ও হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই এর অনুশীলন রাখতে হবে আজীবন। স্বামী-স্ত্রী ব্যক্তি হিসেবে স্বতন্ত্র, তাই তার চাহিদা, আবেগ, অনুভূতির প্রকাশও ভিন্ন। এই ভিন্নতাকে মেনে নিয়েই সুখী পরিবার গঠন করা সম্ভব। দায়িত্ব হিসেবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ ও বহন করে।

◆ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভরণ-পোষণ করা। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনমত ও সামর্থ অনুযায়ী ভরণ-পোষণ করে তবে স্ত্রীরও এতে খুশী থাকা উচিত। স্বামীর একার পক্ষে ভরণ-পোষণ সম্ভব না হলে স্ত্রীকেও এ ব্যাপারে সহায়তা করা কর্তব্য।

◆ স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা জানা, পরস্পর কি কাজ করে তা জানা এবং মূল্য দেয়া

◆ একজন অন্যজনের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা, কথা রক্ষা করা, দুঃখ-কষ্টের সময় সহমর্মিতা দেখানো

◆ আনন্দে অংশ গ্রহণ করা, অসুখের সময় চিকিৎসা করা এবং মানসিক সমর্থন দেয়া, পছন্দ-অপছন্দ জানা

◆ পারস্পরিক ভালমন্দ আলাপ করা, সন্তানদের সম্বন্ধে আলোচনা করা নিজেদের দোষগুণ মূল্যায়ন করা

◆ সঠিক পথ নির্ধারণ করা, পরস্পরকে কাজে সহায়তা করা।

বিবাহিত জীবনে অনেকে প্রথম পর্যায়ে সম্পদ, রূপ লাবণ্য, প্রতিপত্তির মোহে পড়ে দায়িত্ব পালনে আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু সুসময় ফুরিয়ে গেলে দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা ও আগ্রহ ফুরিয়ে যায়। যে সকল স্বামী-স্ত্রী জীবনে সুখী হতে চায় তারা কখনই এ ধরণের ভান করে না।

সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার ফল হলো সন্তান। এ সন্তানকে খুশী মনে গ্রহণ করে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং নিরাপত্তা প্রদান করা পিতামাতা উভয়ের বিশেষ দায়িত্ব। সন্তানের প্রতি পিতামাতার প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব হলো মৌলিক চাহিদা পূরণ করা এবং দ্বিতীয়ত মানুষ গড়ার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

মৌলিক চাহিদা পূরণ করা ঃ বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন মানব শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে কান্নার মাধ্যমে তার অধিকারের কথা, নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করে। প্রত্যেক শিশু পিতামাতার কাছে মৌলিক অধিকার প্রাপ্য। যতদিন পর্যন্ত ছেলেমেয়ে সাবালক/ সাবালিকা না হয়, ততদিন পর্যন্ত (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান,

চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা) পূরণে বাধ্য থাকেন। তাই প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্যই চিন্তাভাবনা করা উচিত কতজন সন্তানের দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব, যাতে সন্তানদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয়। আমরা সবাই এ ব্যাপারে অবগত আছি যে, পৃথিবীতে কোন বস্তুই বর্তমানে আর সহজলভ্য নয়। জীবনের প্রতি পদে পদে অর্থের প্রয়োজন। তাই বলে অর্থের কথা চিন্তা করে কেউ যদি সন্তান ধারণকে বর্জন করে তাহলে সেখানে বিবাহের ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়।

শিক্ষা কার্যক্রম ঃ পিতামাতা হিসেবে তাদের কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে পরস্পরের প্রতি মর্যাদাশীল হলে পরিবারে শান্তি, ভালবাসা ও একতা বিরাজ করে। এই শান্তি ভালবাসা ও একতাই তৈরী করে পারিবারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পরিবেশ। পরিবার হলো, মানুষ সৃষ্টি এবং মানুষ গঠনের কারখানা। তাই পিতামাতা যতবেশী দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ হবে তত কার্যকরী শিক্ষা ছেলেমেয়েদের দিতে পারবে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, একজন শিশুর ৬ বছরের মধ্যে বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচার-আচরণ শিক্ষার সঠিক সময়। পরিবার থেকেই এসব শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। এসব শিক্ষা হলো, জীবনভিত্তিক এবং পিতামাতা নিজেরাই হয়ে ওঠেন বন্ধু ও শিক্ষক। তারপরও বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মৌলিক অধিকার। তাই তাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে ও খোঁজ খবর নিতে হবে। শিক্ষা কার্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়া উচিত –

ক। মূল্যবোধ গঠন শিক্ষা ঃ একজন ব্যক্তির আচরণের চালক ও উদ্দীপক হলো তার মূল্যবোধ। সংক্ষেপে বলতে পারি, মানুষ যার প্রতি মূল্য আরোপ করে, তাই হলো মূল্যবোধ। সঠিক মূল্যবোধ মানুষের জীবনে কল্যাণ ও উন্নতি বয়ে আনে। আমাদের সংস্কৃতি চলমান। তাছাড়া বর্তমান দ্রুততম প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পৃথিবীর যোগযোগ খুব কাছে চলে এসেছে। তাই বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি আমাদের দেশেও প্রবেশ করছে আবার আমরাও বিভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রবেশ করছি। তাই সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের গতি খুব দ্রুত হচ্ছে। তাছাড়া একজন শিশুর জীবনে বাবা-মার, পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মূল্যবোধ, গণমাধ্যমের প্রচারিত মূল্যবোধ শিক্ষকের দেয়া মূল্যবোধ, ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যবোধ ইত্যাদি তাদের জীবনে প্রভাব ফেলছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন্ ধরনের মূল্যবোধ গ্রহণ করা উচিত, কোন্টা উচিত নয় তা বাছাই করার, শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পিতামাতার। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক বাবা-মা বিভিন্ন কারণে-অকারণে পরস্পরকে দোষারোপ, গালিগালাজ, এমনকি দৈহিক নির্যাতন করে। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দ, আদর্শ হওয়ার শিক্ষা বা উপদেশ দিলে, তা তাদের জীবনে অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। তাই প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন। এই নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি পরিবার থেকেই গড়ে ওঠে। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে দায়িত্বশীল ও পরিপক্ব হতে সাহায্য করে। শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, সুশিক্ষা-কুশিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে ভালমন্দ দু'ধরণের অবস্থা থেকে যাতে ভাল, সুন্দর, ন্যায় ইত্যাদি বাছাই করতে পারে সেজন্য পিতামাতার কাজে কর্মে এ ধরনের উদাহরণ রাখতে হবে।

খ। মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নের শিক্ষা ঃ মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই তার চাহিদা, আবেগ, অভিজ্ঞতা, অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করতে চায় এবং এভাবে গড়ে ওঠে মানবিক সম্পর্ক। এক্ষেত্রে পারস্পরিক মর্যাদা, শ্রদ্ধাই হলো এই সম্পর্ক উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ। পরিবার সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। সুসম্পর্ক হলো, একটি আদর্শ পরিবারের মৌলিক বিষয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক তৈরী করতে না পারলে কখনো পরিবার শান্তির নীড় হতে পারবে না। পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য একত্রে বসে আলাপ-আলোচনা করা পরস্পরকে গ্রহণ করা, পরস্পরকে মর্যাদা দেয়া ও সম্মান করা, ভাল কাজের স্বীকৃতি বা সমর্থন দেয়া, পারিবারিক কাজে সহভাগিতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, একত্রে পারিবারিক প্রার্থনা, নামাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি খুবই সহায়ক।

পাশাপাশি শিশুদের প্রতি অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা, অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেয়া, বাবা-মার অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন, কঠোর মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। বাবা-মা ও শিশুর মধ্যে সম্পর্কের সূচনা

হয় শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে। এছাড়াও খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, আদর, স্নেহের ভিতর দিয়ে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্রমে শিশু মায়ের উপর নির্ভর করতে শেখে। ভয়-ভীতিতে মাকে কাছে পেতে চায়। একটু বড় হলে, ভাইবোনদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিশু বিশেষ করে বাবা-মার আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অনুকরণ করে। বাবা-মার স্বাভাবিক স্নেহ, মায়া-মমতা আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়, যা সামনের জীবনে চলার পথে সাহায্য করে। অন্যদিকে তা না পেলে, আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয় এবং সঠিকভাবে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। আবার অতিরিক্ত স্নেহ, মায়া-মমতা স্বনির্ভর হতে বাধার সৃষ্টি করে। শিশুর জীবনে পিতামাতার সম্পর্ক যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুর কোন অন্যায় অপরাধের জন্য কঠোর শাসন করলে শিশু জেদী হয় এবং জিদের বশবর্তী হয়ে আরো বেশী অন্যায় করে, পিতামাতার প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করে। অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে, শিশুর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা, বাবা-মার প্রতি শিশুর প্রত্যাখ্যানের ফলেই সৃষ্টি হয়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব

মানুষ সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য প্রতিটি ব্যক্তি মানসিক সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করে। সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দল বা সমষ্টিই “সমাজ’ এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানসিক সূত্রের বন্ধনই “সমাজ”। পরিবারে যেমন কিছু রীতিনীতি থাকে তেমনি সমাজেও কিছু রীতিনীতি থাকে, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন সমাজের অবকাঠামোতে যদি ভাঙ্গন, উচ্ছৃঙ্খলা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়, তাহলে খুব সহজেই বুঝা যায়, পরিবারেও একই অবস্থা আছে কেননা পরিবারই মানুষ গড়ার কাজটি সম্পন্ন করে, যা সমাজে প্রতিফলিত হয়। সমাজের রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ থেকেই প্রমাণিত হয় পরিবারের বাস্তব চিত্র। সমাজ ও রাষ্ট্র তখনই সুশৃঙ্খলভাবে চলে যখন জনগণের স্বভাব, মনোভাব ও আদর্শের স্থায়িত্ব আসে। এই বিষয়গুলোর ভিত্তি পরিবার থেকে গড়ে ওঠে। শিশুরা শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার প্রথম পাঠ পরিবারেই লাভ করে। যখন পিতামাতা এ দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করে তখন সে সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বগুলিও সঠিকভাবে পালন করে থাকে।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ব

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখাই মানুষের ধর্ম। পৃথিবীর কোন বস্তু বা মানুষ ধ্বংস করার অধিকার মানুষের নেই। এগুলো শুধু রক্ষণাবেক্ষণ ও বংশ পরম্পরায় ভোগ করাই মানুষের দায়িত্ব। সুস্থ, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত। যখন আমরা নিজ নিজ দায়িত্বগুলো পালন করি তখন সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। বিভিন্নভাবে আমরা এই দায়িত্ব পালন করতে পারি যেমন – আমাদের যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব সন্তুষ্ট মনে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ ও পালন করা, গর্ভের সন্তানকে খুশী মনে গ্রহণ করা ও জীবন রক্ষা করা, বিপদের সময় ধৈর্য প্রদর্শন করা ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখা, প্রতিবেশীকে প্রেম করা, দরিদ্রদের সাহায্য করা, মানুষকে মূল্য দেয়া, নিজেদের প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি। নানাভাবে মানুষ মানুষের কল্যাণের পক্ষে কাজ করতে পারে। এগুলো করার অর্থই হলো সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালন করা। পরিবারেই বদান্যতার শুরু, সততা, সাধুতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, ধৈর্য, সহভাগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ পরিবার থেকেই আসে, যেগুলো বিশ্বস্রষ্টার প্রতি আমাদের দায়িত্বশীল করে তোলে।

পরিবার পরিকল্পনা

দায়িত্বশীল পরিবার গঠন করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। পরিকল্পনা হলো, লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক কিছু পূর্ব চিন্তা বা উপায় নির্ধারণ এবং পরিবার পরিকল্পনা হলো আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার সহায়ক কিছু পূর্ব চিন্তা বা ধ্যান ধারণার সমন্বয়। খুব সহজ ভাষায় বলা যায়, পরিবারের মঙ্গলের জন্য যে চিন্তা ভাবনা ও ছক তৈরী করা হয়, তাকে পরিবার

পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ পরিবারের প্রতিটি সদসস্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্যগত দিকের প্রতি খেয়াল রেখে পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে। তাই সমাজ বিজ্ঞানসমূহে পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক অর্থ বহন করে। সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজ কল্যাণে পরিবার পরিকল্পনা হলো এমন এক সুচিন্তিত ও সুবিস্তৃত প্রক্রিয়া ও কর্মসূচী, যার মাধ্যমে পরিবারের আর্থ-সামাজিক সংস্থানের সাথে সামঞ্জস্যশীল সন্তান-সন্ততি লাভ, লালন-পালন ও তাদের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং "দু'টি সন্তানই যথেষ্ট/ একটি কাম্য" এটা হলেই কেবল পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় না। পরিবারের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনাকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

১) সাধারণ পরিকল্পনা

- পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা
- পরিবার পরিজনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন
- পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা

২) কার্যগত পরিকল্পনা

- কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সামর্থ অনুযায়ী সন্তান নেয়া
- মা ও শিশু স্বাস্থ্যের যত্ন
- নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ
- পারিবারিক বাজেট তৈরী ও অনুসরণ
- উৎপাদন ও সঞ্চয় বৃদ্ধি
- সুষম খাবার গ্রহণ ও সমবন্টন
- বয়স অনুপাতে কাজের বন্টন।

৩) উৎসাহভিত্তিক বা বিনোদনমুলক পরিকল্পনা

- চিত্ত বিনোদন
- সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ

যদিও এ বিষয়গুলো পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তথাপি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সন্তান সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাখা। বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশের অনেক পরিবারে সন্তানকে তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার সামর্থ অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে অধিক সন্তান রয়েছে। শিক্ষার অভাব, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা, নারী শিক্ষার অভাব, স্বামী-স্ত্রীর অসম সম্পর্ক, নাম, বংশ রক্ষা ও শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য, জীবন যাত্রার নিম্নমান, উত্তরাধিকার আইন, জলবায়ুর প্রভাব, চিত্ত বিনোদনের অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, প্রজনন জ্ঞানের অভাব, বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার তাড়না, জন্মনিয়ন্ত্রণে অনীহা ইত্যাদি দায়ী। সত্যিকার অর্থে উপরোক্ত সমস্যাগুলোকে সমাধানের চেষ্টা না করে শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে জনসংখ্যা রোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাস্তবসম্মত নয়। আবার জনসংখ্যা কমে গেলেই উন্নয়নের জোয়ার বইবে, সেটাও ঠিক নয়। কেননা বিভিন্ন গবেষণার প্রতিবেদনে দেখা যায়, অনেক পরিবারে সন্তান সংখ্যা কমেছে, পাশাপাশি আদর্শ পরিবারের সংখ্যাও কমেছে। এখানে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শুধুমাত্র সন্তান সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় থাকলেই পরিকল্পিত পরিবার বা সুখী পরিবার গঠন করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো বিরাজ করছে, সেগুলোর সঠিক সমাধানেই আমরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় জনসংখ্যা রাখতে পারবে।

দায়িত্বশীল পরিবার গঠনের অন্তরায়

শিক্ষার অভাব ঃ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কি দায়িত্ব আছে, সে সম্পর্কে অনেকে জানে না। না জানার কারণে দায়িত্ব পালন করে না। যা পরিবারে পারস্পরিক অশ্রদ্ধা, বিশৃঙ্খলতা অশান্তি বয়ে আনে।

আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা ঃ অনেকে আছে, যারা শুধু নিজের কথা ভাবে। অন্যের জন্য কিছু না করে বা দায়িত্ব পালন না করে সুখী হতে চায়। ফলে পারিবারিক অধিকার থেকে সদস্যরা বঞ্চিত হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

অদৃষ্টবাদী মনোভাব ঃ অনেকে পারিবারিক সুখ-শান্তি বিষয়টি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বলে বিশ্বাস করে। তাই দায়িত্ব পালনের প্রতি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না।

দরিদ্রতা ঃ অর্থের অভাবে অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। কারণ অভাব অনটনের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা করতে করতে অনেক সময় পেরিয়ে যায়, তাই খোলামেলা আলাপ-আলোচনা

করার মানসিক অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হয় না, ফলে একজন অন্যজনকে ভালভাবে বুঝতে পারে না।

পরিকল্পনার অভাব ঃ পরিবারের কোন্ কাজ আগে বা কোন্‌টি পরে করতে হবে, তা সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে দায়িত্বও সঠিকভাবে পালন করা যায় না। ফলে পারিবারিক অশান্তি বাড়ে।

দায়িত্বশীল পরিবার গঠনের জন্য করণীয়/ বৈশিষ্ট্য

- বিবাহিত জীবনে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো, একজন অন্যজনকে ভালবাসা এবং শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকা।
- সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও সমর্থন রেখে বাস্তববাদী হওয়া
- সন্তানকে বিবাহিত জীবনের ফল হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তা তাদের জীবনে নিশ্চিত করা
- যে কোন অবস্থায় পারস্পরিক সম্মান ও বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ন রাখা
- দিনে কমপক্ষে একবার সকলে একসাথে বসে খাবার গ্রহণ করা বা মিলিত হওয়া
- ছেলে ও মেয়েকে সমমর্যাদার ভিত্তিতে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা
- শক্তি সামর্থ অনুযায়ী কাজ এবং বয়স অনুপাতে খাবার বন্টন নিশ্চিত করা
- যে কোন সিদ্ধান্ত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নেয়া এবং সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হওয়া ও ন্যায্য সমাধানে পৌঁছানো।
- স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক তথ্য সার্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সন্তান সংখ্যা নির্ধারণ করা
- কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সন্তান সংখ্যা রাখার জন্য পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি (যা উভয়ের স্বাস্থ্যগত দিক নিশ্চিত করে) গ্রহণে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- ছেলেমেয়েদের সময় দেয়া, চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলা
- পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা
- পরিবারে সকল সদস্যদের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা
- ছেলেমেয়েদের সঠিক যৌন শিক্ষা দেয়া এবং সামাজিক কুসংস্কার সম্বন্ধে সচেতন করা
- পরিবারে সকলের জন্য সমানভাবে চিন্তা করা
- পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা।

দায়িত্বশীল পরিবার গঠনের ফলাফল

- পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের মর্যাদা ও মূল্য বুঝতে চেষ্টা করে ও তা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে।
- পরিবারে ন্যায্যতা বজায় থাকে এবং যার যার অধিকার ভোগ করতে পারে। প্রয়োজনে একে অন্যের জন্য ত্যাগস্বীকার করে।
- পরিবারে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়
- পরিবারে খোলামেলা আলাপ-আলোচনার পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং পরিবারের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- কথায় ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে একজন অন্যজনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে।
- সম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে নারী-পুরুষের বৈষম্যতা হ্রাস পায়।
- পরিবারে আয় বুঝে ব্যয় করে এবং সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ে।
- কাজ ও খাবারের সমবন্টন হয় এবং অপুষ্টির হার কমে।

একটি পরিবারের পার্থিব সুখ-শান্তি সবাই আশা করে। কিন্তু এই আশা তখনই বাস্তবায়িত হয়, যখন এর প্রতিটি দায়িত্ব সম্পর্কে সকলে সচেতন হয়। পরিবারের কোন বিষয়ই হালকা বা ছোট করে দেখা উচিত নয়। কারণ পারিবারিক সুখ শান্তি একটি আপেক্ষিক বিষয় এখানে মানবীয় দিকগুলো সবচেয়ে বেশী আবেদন রাখে। তাই মানুষ সারাদিনের কাজের সমাপ্তি টেনে ক্লান্তি ঝেড়ে মুছে শান্তির পরশ পাবার জন্য পরিবারে ফিরে আসে ও একত্রিত হয়।

সৌজন্যে ঃ এন এফ পি।